দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকান্ড

না, শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হল, সন্ত্রাসের মূল এখনও উৎপাটিত হয়নি। গত ১ নবেম্বর প্রকাশ্য দিবালোকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ছাত্রকে তাড়া করে প্রশাসনিক ভবনের ভেতরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করেছেন বেশ কয়েকজন অস্ত্রধারী যুবক। এই হত্যাকান্ড সংঘটনের জন্য তারা এমনই মরিয়া ছিল যে, প্রশাসনিক ভবনের কক্ষে নিহত ছাত্র জিন্নাতুল ইসলাম জিন্নাহ যখন কর্মকর্তাদের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখনও অস্ত্রধারীরা ছাড়েনি। তারা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরও রেহাই দেয়নি, পালিয়ে যায়নি। হত্যাকান্ড সমাপ্ত করেই অস্ত্র উচিয়ে চলে গেছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হত্যাকান্ড, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের হত্যাকান্ড সংঘটিত হবার পরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শান্ত ছিল। হয়ত ধারণা করা হয়েছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের ঘটনা ঘটবে না। ঢাকা বিশ্বরিদ্যালয় হত্যাকান্ড থেকে মুক্ত ছিল অনেক দিন, সন্ত্রাসী ঘটনাও এখানে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় কম ছিল কিছুদিন। কিন্তু গত ১ নবেম্বরের ঘটনা একথা আবার প্রমাণ করল, সেখানেও দৃশ্যের সামান্য নিচেই অদৃশ্য হয়ে আছে সন্ত্রাসীর ঘাতক অস্ত্র। তা যে কোন সময়, যে কোন কারণে ঝলসে উঠতে পারে। কেড়ে নিতে পারে অমূল্য প্রাণ, এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারে নিরপরাধ নির্বিরোধ সাধারণ মানুষের দেহও।

সমাজে সন্ত্রাস আছে, কখনও কখনও সামাজিকভাবে এইসব সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা আত্মগোপন করে থাকে। অস্ত্র লুকিয়ে রাখে, তাদের ঘাতক অস্ত্র পরিত্যাগ করে না। তারা থাকে সুযোগের অপেক্ষায়। সুযোগ পেলেই বেরিয়ে আসে তারা নিজেরা, তাদের অস্ত্রসহ।

গত কয়েক মাসে সারা দেশের সন্ত্রাসী ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়; দেশের সকল রাজনৈতিক দলের অব্যাহত সন্ত্রাসবিরোধী বক্তব্য, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সকল অভিযান, সন্ত্রাস দমন আইন সন্ত্রাসীদের মোটেও নিরস্ত করতে পারেনি। তারা আছে এবং প্রবলভাবেই আছে।

এই সন্ত্রাসী ঘটনা জনজীবনকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে। সন্ত্রাস উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যাহত করেছে। সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা নির্মাণ কাজে বাধা দিচ্ছে, সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে টেন্ডার নিয়ে মহল্লায় মহল্লায় ঘাপলা হয়েছে। সন্ত্রাসীরা দেশের শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট করেছে তাদের অপতৎপরতায় গোটা জনজীবন অস্থির হয়েছে।

এই ঘটনা শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্তপাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। এই সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে পাড়ায় পাড়ায়। ক্ষুদে মাস্তানেরা বড় টেন্ডার নিয়ে জটিলতা সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে না, তারা পাড়ার মুদী দোকানে হামলা চালিয়েছে, তারা সন্ধ্যা রাতে ছিনতাইয়ে ব্যাপৃত হয়েছে, কখনওরা পাড়ায় বা মহল্লায় কিংবা নিজস্ব এলাকা থেকে দূরে গিয়ে চাঁদাবাজি করেছে। সেভাবে বড় মাস্তানের পোঁ ধরে ছোট মাস্তানের জন্ম হয়েছে; বেড়েছে মাস্তান বা সন্ত্রাসীর সংখ্যা।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যই সরকার সন্ত্রাসমূলক অপরাধদমন আইন জারি করেছেন। সে আইনে ইতিমধ্যে বহু লোকের বিচার ও শাস্তি হয়েছে। সে আইন জারির ফলে সংখ্যার দিক থেকে সন্ত্রাসী ঘটনা কমলেও তা নির্মূল হয়নি। সন্ত্রাস আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ নবেম্বরের হত্যাকান্ডের পর পুলিশ বরাবরের নিয়ম অনুযায়ী গত ৩ নবেম্বর তিনটি হলে তল্লাশী অভিযান চালিয়েছে। কিন্তু ৩ নবেম্বরের ওই তল্লাশী অভিযানে পুলিশ কোন সন্ত্রাসীকেও যেমন ধরতে পারেনি, তেমনি কোন অস্ত্রও উদ্ধার করতে পারেনি। এই নিয়মেই তল্লাশী অভিযান চলে। যখন হত্যাকান্ড বা গোলাগুলির মত মারাত্মক ঘটনা ঘটে, তার পরদিন, বা দু একদিন পর পুলিশ হলগুলো তল্লাশী করে এবং কাউকে সহজে ধরতেও পারে না, কিংবা কোন অস্ত্রশস্ত্রও উদ্ধার করতে পারে না। অস্ত্র যে পথে আসে, সে পথেই ফিরে যায়।

কিন্তু প্রস্তুতি যখন চলে, ক্যাম্পাসে অস্ত্র এসে যখন জমা হয়, সে অস্ত্র যতক্ষণ ঘাতকের রূপ না নেয়, ততক্ষণ পুলিশ আজ পর্যন্ত তেমন কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

ক্যাম্পাসে কোন কারণে যখন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, যখন অস্ত্র আসতে শুরু করে, তখন সাধারণ ছাত্ররাও তা টের পায়; কর্তৃপক্ষের তা দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। অথচ এড়িয়ে গেছে, এড়িয়ে যাচ্ছে দীর্ঘকাল ধরে।

এ ছাড়া একথাও তো সত্য যে, গত ১ নবেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোতায়েন ডজন ডজন পুলিশের উপস্থিতিতেই জিন্নাতুল ইসলাম জিন্নাহ নিহত হন। সূর্যসেন হলের সামনে থেকে জিন্নাহকে ধাওয়া করে প্রশাসনিক ভবনে নিয়ে আসে ৭/৮ জন সন্ত্রাসী। জিন্নাহ দৌড়ে গিয়ে প্রথমে আশ্রয় নিয়েছিল ১২৪ সি কক্ষে, পরে ১২৪ বি-তে। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা প্রশাসনিক ভবনের ভেতরে ঢুকে তাদের এই তান্ডবলীলা চালাবে না, হয়ত ফিরে যাবে, হয়ত প্রাণে রক্ষা পাবেন তিনি।

কিন্তু তার সে ধারণা সত্য হয়নি। সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা প্রশাসনিক ভবনের বাইরে থেকে কাটা রাইফেলে গুলি করতে করতে এগিয়ে যায় প্রশাসনিক ভবনের সেই কক্ষে এবং শেষ পর্যন্ত নির্বিচার গুলিবর্ষণে হত্যা করে জিন্নাতুল ইসলাম জিন্নাহকে। এই পুরো ঘটনা আধঘন্টারও বেশী সময় ধরে ঘটেছে। ঘটেছে যখন, তখন পুলিশ ছিল গোটা ক্যাম্পাস জুড়ে। প্রশাসনিক ভবনের আশেপাশেও পুলিশ থাকে। একথা হয়ত বলা যায়, পুলিশ ওই কাটা রাইফেলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে না। কিন্তু ওই অস্ত্রধারীদের পুলিশ চেজ করতে পারত না, ধাওয়া করে ধরতে পারত না একথা বিশ্বাস করা যায় না। অথচ এ রকম ক্ষেত্রে পুলিশ কখনও সন্ত্রাসী কিংবা ঘাতকদের ধরতে পারেনি। কিন্তু দু একদিন পর সন্ত্রাসীদের ধরবার জন্য বার বার হল তল্লাশী করে শূন্য হাতে ফিরে এসেছে।

কার্যত সন্ত্রাসপ্রবণ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এভাবে যে অস্ত্র উদ্ধার করা যাবে না, এ প্রক্রিয়ায় যে সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ধরা যাবে না, সে কথা শিশুও বোঝে। কিন্তু ঘটনার ধারাবাহিকতা চলছে এভাবেই।

আসলে সন্ত্রাসীদের ধরবার জন্য পুলিশের ভূমিকায়ও পরিবর্তন দরকার। সন্ত্রাসবিরাধী সতর্কতার জন্যই যদি ক্যাম্পাসে ডজন ডজন পুলিশ মোতায়েন করা হয়ে থাকে, তবে তারা সন্ত্রাসের সময় কেবল নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবেন, এই-ই বা কেমন কথা। তাছাড়া হত্যাকান্ডের মত নৃশংস সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়ে খুনীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হলে বসে থাকবে-এ আশাই বা পুলিশ কর্তৃপক্ষ কেমন করে করেন, বোঝা দায়।

ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাসের ঘটনা নির্মূল করার জন্য সেখানে অস্ত্রের আনাগোনা বন্ধ করতে হবে। সন্ত্রাসের মূলোৎপাটনের জন্য প্রয়োজন আরও কঠোর ব্যবস্থা। অস্ত্রের উৎসপথ বন্ধ করতেই হবে। এই অস্ত্রের আমদানী শুধুমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীদের জীবনের নিরাপত্তাই বিঘ্নিত করছে না ক্যাম্পাসের সাধারণ ছাত্র শিক্ষক কর্মচারীদের জীবনের নিরাপত্তাও মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করছে।

এই সত্য আমাদের মেনে নিতে হবে, সন্ত্রাস আছে। সে সন্ত্রাসমূলক তৎপরতা কখনও কিছুটা হ্রাস পেলেও সন্ত্রাসীরা তাদের তৎপরতা থেকে বিরত হয়নি। তারা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। সুযোগ পেলেই নিজেদের স্বমূর্তিতে বেরিয়ে আসে।

তাই সন্ত্রাস দমনের জন্য কঠোরতম ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। সরকার দলমত নির্বিশেষে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন তা আরও জোরদার করে তোলা প্রয়োজন।

— রেজোয়ান সিদ্দিকী